আমঝরিয়া

তখন আমরা রাঁচির রেলওয়ে কোয়ার্টারে। মেজদা (মুকুন্দলাল) এর আতিথ্যে তাদের মেসে দিন দশেক ধরে বসে আছি। হাতে অর্থাভাব। দূরে ঘুরতে যাব সে সামর্থ্য নেই। ট্যাঁকের অবস্থা হিসেবপত্র করে মানিকদাকে বললাম — না মানিকদা, এ দফায় নেতারহাট যাওয়া হচ্ছে না।

এ ঘটনা আজকের নয়। ষাটের দশকের ।

ট্যুরিস্ট গাইডে পাওয়া যাবে নেতারহাটের সপ্রশংস নাম। রাতু রোড ধরে লোহারডগা হয়ে ছিয়ানব্বুই মাইল দূরে নেতারহাট। সমুদ্রতল থেকে ৩,৭০০ ফুট উপরে। রাঁচির উচ্চতাই তো প্রায় ২,১০০ ফুট। নেতারহাটের সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত না দেখলে রাঁচি বেড়ানো অসফল থেকে যায় নাকি। দেখা হয় না কোয়েলের দৃশ্য কিংবা ঘঘরা ফলস।

মানিকদা বললেন — হল না যখন, এক কাজ কর।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলাম — কি কাজ বলে ফেলুন।

মানিকদা ভ্রমণ-সৌখিন মানুষ। প্রতি বছর সুযোগ সুবিধে মতো উনি ঠিক বেরিয়ে পড়বেন কোথাও না কোথাও। সেসবের অনেক গল্প শুনেছি। ফলে মানিকদাকে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। আমার মেজদা সে রসে বঞ্চিত। অফিস থেকে ফিরে দাবা নিয়ে বা ক্যারাম নিয়ে রোজ আড্ডা বসত আমাদের। নানা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলতেন মানিকদা ।

একদিন হরিদ্বারের গল্প বলেছিলেন।

— বাড়ির লোকজন নিয়ে বেরিয়েছি সেবার। মা বউদি আর এক ভাইঝিকে নিয়ে হরিদ্বারের পথে। অফিসের শ্যামাচরণ বলে দিয়েছিল হরিদ্বারে ও এক সাচ্চা সাধুর দেখা পেয়েছিল। তাঁকে দেখে সত্যিই ভক্তি(হবে। কেমন মহাপু(ষ মহাপু(ষ চেহারা। ভাবলাম — কি জানি হবে হয়তো। হরিদ্বারে পৌঁছে আমিও তালে তালে রয়েছি সে রকম সাধুবাবার দর্শন পেলে জীবন সার্থক করার সুযোগ ছাড়ছিনে। বুঝলে, সেখানে গিয়ে দেখি অনেক সাধুর মেলা। এক একজনের এক এক রূপ। কেউ আগুন জ্বালিয়ে

বসে আছে। কেউ দু'পা আকাশে উঁচিয়ে উর্ধ্বপানে। কেউ আবার গাছের ডালে ঝুলে আছে। কৃচ্ছসাধনের ধরণ দেখে মনে ভক্তি(ভাব আসতে বাধ্য। এরা যেন অনেককাল ধরে এমন তপস্যা করছে তো করছেই। প্রণামী দিয়েটিয়ে আঁখড়া ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। পথ বাঁক নিয়েছে সামনে । হঠাৎ কি মনে হল বাঁক থেকে ফিরে এলাম আঁখড়ার দিকে। উঁকি দিয়ে দেখলাম কি জানো? দেখলাম সেই সব ঘোর তপস্যারত সাধুবাবারা আসন ছেড়ে সদলে জড়ো হয়েছে, পায়চারি করছে আর বিড়ি ফুঁকছে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। মানিকদা বললেন — আমার মনে হয় কি জানো সাধুদের দলে একজন সিগন্যালম্যান আছে। যাত্রী দেখলেই ইশারা করে দেয়। অমনি সকলে তপস্যায় বসে যায়। দর্শক চলে গেলে আবার দেদার আড্ডা। এই হল আমাদের শ্যামাচরণের সাচ্চা সাধুবাবার আঁখড়া।

শ্যামাদা তবু প্রতিবাদ করে — সত্যি বলছি, আমি দেখেছিলাম।

মানিকদা মেজদা দু'জনে ধমকে ওঠেন — ধ্যেৎ, রাখো তোমার সাচ্চা সাধু। সব ভণ্ডের দল।

এরকম নানা গল্পের আসর বসত। এহেন মানিকদা যখন বলেছেন নেতারহাটের বদলে অন্য কোন জায়গার কথা, তো সেটা দা(ণ কিছু হতে বাধ্য।

— আমরা যখন টোরিতে ছিলাম তখন প্রায়ই যেতাম আমঝরিয়া। চলে যাও তোমরা, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। মানিকদা নিশ্চিত বললেন।

— এর নাম তো শুনিনি আগে।

— শোনার দরকার নেই। আর হ্যাঁ কাগজ কলম নিয়ে যেও কবিতা লেখার ঝোঁক এসে যেতে পারে।

কমলেন্দু বলল — সে ও লিখুক কবিতা যত পারে। আচ্ছা, যাবো কি করে?

— রাতু রোডের প্রাইভেট বাস টার্মিনাসে যেতে হবে। বড়োবাজারের মধ্য দিয়ে। ওখানে ডালটনগঞ্জ, টোরি বা চাঁওয়ার বাস পাবে। উঠে পড়বে। শুধু কণ্ডাক্টরকে বলে রাখতে হবে আমঝরিয়ায় যেন নামিয়ে দেয়। রাঁচি থেকে দূরত্ব তিরিশ মাইল।

বেতার ভবনের পাশ দিয়ে রাতু রোড। বাসে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শু(করল। খানিকটা চলার পরে চেনা স্টপেজ পেলাম কুরু।

ইতিমধ্যে নিকষ কালো পাথর জায়গায় জায়গায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। কোথাও দেখি পাথরের স্তূপ। বাসের অন্য যাত্রীরা বলতে পারল না আমঝরিয়া আর কতদূরে। কুরু থেকে দূরত্ব শুনেছি সাত মাইলের মতো।

কণ্ডাক্টর একসময় বলে উঠল — এহি আমঝরিয়া হ্যায়। উতারনা হ্যায় তো উতার যাইয়ে। সামান হ্যায় কুছ?

— না না কোন সামান নিয়ে আসিনি।

নেমে পড়লাম বাস থেকে। নিতান্ত জনবিরল এলাকা। ধারেকাছে জনবসতি নেই। দূরে দুয়েকটি দরিদ্র কুটির নজরে এল। রাস্তার ডানদিকে লাল মোরামের পথ। এগিয়ে গেলাম ভয় তাড়ানো চিৎকৃত গান গাইতে গাইতে।

সামনে টিলার উপর ছোট্ট একখানা বাংলো। একদিকে টানা বারান্দা। পিছনে দুটি কামরা। বারান্দার উপর বসে পড়লাম। আমঝরিয়া বোধ হয় রাঁচির মতো উচ্চতার হবে। ডাক বাংলোর ভিত্তি প্রস্তরে লেখা সেরকমই ছিল বলে মনে পড়ছে।

কমলেন্দু জোর গলায় বলে উঠল — চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এ জায়গাটা যে ভালো বলবে না সে একটা মানুষই না।

চারদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উঁচু টিলার উপর চমৎকার ডাকবাংলো। শীতের মরশুম। নানা ফুলের আয়োজন আছে বাগানে। নানা বর্ণের ফুলসাজ। বারান্দার টবে বাহারী অর্কিড। বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির দুপাশে গোল করে আগলে রাখা জায়গায় টব সাজানো। আর সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে সামনে এগিয়ে গিয়েছে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা। একটু দূরে বাঁধানো গোলাকার বেদী। অর্ধচন্দ্রাকৃতি আসন।

তারপর পাহাড়ের ঢল নেমেছে অনেক দূর। অরণ্য নেমেছে। কাছের আরেকটা পাহাড় সঙ্গে নিয়েছে সবুজ সবুজে মাখামাখি করতে। নিচে ছড়ানো উপত্যকা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। অনেকটা সবুজ গাছপালায় ঢাকা। আদিম অরণ্য? না, তেমন ঘন অরণ্য নয়। আর সবুজের মধ্যে ইতিউতি লালমাটির শোভা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটাকয়েক সাঁওতাল কুটির আছে। গরু চড়ে বেরাচ্ছে বুঝি বনের পথে। তাদের দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে ঘণ্টার শব্দে। আবার ওই মৃদু শব্দ কি ঝর্ণার শব্দ বলে মনে হতে পারে?

দূরের অস্পষ্ট শব্দ হলে এরকম নাকি হতেও পারে। কমলেন্দু বলছিল। ঠিক জানি না। আমরা ভাবছিলাম। আকাশ পরিষ্কার নীলিমায় উজ্জ্বল। দূর দিগন্ত অবধি দৃষ্টি ছুঁড়ে দাও। অনায়াসে পৌঁছে যাবে দিগন্তরেখায় যেখানে জমিন আর আশমানের মিলন হয়েছে। হালকা কুয়াশার অবগুণ্ঠনে অস্পষ্ট পাহাড়ের ধূসর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। রহস্যময়। কি যে ভালো লাগছিল আমাদের! চোখ যেন নয়ন হয়ে যায়। যায় না?

কোন লোক নেই। আমরা ছুটে ছুটে দেখছি। বাংলোর ভিয়ু পয়েন্ট কোথায় হতে পারে। কমলেন্দু তো পাহাড়ের ঢল বেয়ে নিচে ছুটে যাবেই।

নিষেধ করলুম — যেও না। এখানে বসেই দ্যাখো না।

— চলো তাহলে মালির খোঁজ করি।

কালো পাতলা চেহারার এক যুবককে পেলাম। নাম লালু ওঁরাও। আদিবাসী কিন্তু পরনে খাকি প্যান্ট আর সাদামাটা ছিট কাপড়ের সার্ট। সাহেবসুবো না এলে লালুই বাংলোর সর্বেসর্বা।

ও বলল - সামনে যে লম্বা পাহাড় দেখাই দে রহা, উসকা নাম মালহান পাহাড়। বাঁদিকে আউর পাহাড় আছে। নজদিখে আছে, দূরমে আছে। পাহাড়িয়া রাস্তা বানা বানাকে তো নেতারহাট যানেকা রাস্তা। কোনসা পাহাড়? উসকো কহতে হ্যায় খোটুয়াগ পাহাড়।

সত্যি খোটুয়াগ নামে কোন পাহাড় আছে কি না জানি না। লালু বলল — ওহি দূরি পর একঠো লাল ঘর দেখাই দে তা হ্যায় না? মিলা নজরমে?

নিচের লাল মাটির উপত্যকা সবুজ-লালে মাখোমাখো। হাঁ ওখানে লাল রঙের একখানি ঘর দেখা যাচ্ছে।

লালু বলল — উয়ো হ্যায় রেলকা কেবিন। স্টেশনকা নাম মহুয়ামিলান।

কমলেন্দু টেনে টেনে উচ্চারন করল — ম-হু-য়া-মি-লা-ন। বেশ সুন্দর নাম তো। একটু যেন চেনা চেনা লাগছে।

— পহচানসি হ্যায়? সো তো হতেই পারে। ওখানকার জল বহুৎ মিঠাস আছে। বহুত বাবুলোক চেঞ্জে আসে, ওখানে থাকে। যাদের পেট-কা বিমারি আছে, গরবর আছে, উনলোগোকি লিয়ে বহুৎ আচ্ছা হ্যায় ও।

গোমো থেকে শাখালাইন গিয়েছে মহুয়ামিলানে। শালমহুয়ার দেশে। রাঁচি থেকে ন্যারো গেজ লাইন শেষ হয়েছে বক্সাইটে সমৃদ্ধ লোহারডগায়।

আমরা কি কোনদিন মহুয়ামিলানে যাবো? অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদনি রাতের মাদলে বিভোর হবো?

লালুর কাছে জানতে চাই — এখানে আর কিছু দেখার আছে কি?

ও বলল — না বাবুজি, খাস কুছু নেহি। কুরু থেকে ইধার আনেকা টাইম একটো ফলস মিলবে। নাম নাম নাম — হ্যাঁ, উসকো নাম কান্তি ফলস। কুরু থেকে তিনচার মাইল আনেকা বাদ কাঁচ্চা রাস্তা মিলবে, আউর তিন মাইল অন্দর জঙ্গলমে যানা পড়েগা। তারপর মিলবে ফলস। উঁচাই? ঠিকসে মালুম নেহি। সমঝিয়ে দেড়শ' ফুট উঁচাই হবে। আউর এক ফরেস্ট হ্যায় কুরুমে।

ফরেস্টে বাঘ-ভাল্লুক আছে কিনা জানতে চাইলাম। কেননা আমাদের কাছে মনে হল যে যেন বাঘ-ভাল্লুক না থাকলে কোন জঙ্গল জঙ্গলই নয়।

লালু বলল — নেহি বাঘ আছে না। ছোটামোটা জানোয়ার আছে। আর বহুৎ চিড়িয়া আছে। একঠো ফরেস্ট অফিস আছে।

কমলেন্দু উৎকৃষ্ট হিন্দি বলে। কিছু কথা না বলে পারল না — এই স্থান তো বহুৎ সুন্দর আছে। তুমকো আচ্ছা নেহি লাগতা?

লালু মাথা নাড়ল। বলল — নেহি বাবুজি, মেরে পাস ইয়ে সব কুছ ভি নেহি। ইধার পাহাড়মে বাবুলোক আতে, দুচার রোজ রহতে, উনকো এহি পাহাড় জঙ্গল আচ্ছা লাগতা। উনলোগকো ইহা ঘুমনেকে লিয়ে দিল চাহতা হ্যায়। ম্যয়নে তো বহুৎ দেখা। ছোটাসে এহি দেখতে রহে। মেরে পাস ইয়ে কুছ ভি নেহি। সাঁচ বাতাতে তো মেরা দিল চাহতে হ্যায় শহর ঘুমনেকে লিয়ে।

এই এক বিপরীতমুখী স্রোতধারা। আমরা শহরবাসীরা চাই শহরের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে। অনাবিল প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়াতে ছুটে যাই। আর এই সরল গ্রাম্য মানুষেরা পাহাড়-বন-আকাশের উদার বিস্তৃতির মায়া ত্যাগ করে শহরের আলোকমালায় সাজানো ছেঁড়া আকাশের নিচে চাকচিক্য আর বিলাসিতার ঝলসানিতে মুগ্ধ হতে উন্মুখ। জানতে চাইলাম কখনো শহরে গিয়েছিল কিনা। বলল যে ও একবার মাত্র রাঁচি গিয়েছিল। ব্যস ওই একবারই। জিজ্ঞাসা করল — আমরা কোথা থেকে এসেছি।

তারপর নিজেই বলল, মালুম হচ্ছে কোলকাতা থেকে ।

লালুকে বললাম — শহর থেকে তোমাদের এই জায়গা এই জমি-পাহাড়-জঙ্গল অনেক বেশি ভালো। শহর তো ভাই এক জঞ্জাল।

এ কথা শুনে লালু হেসে খুন। সাঁওতাল যুবকের কলহাস্য এখানকার রুখু প্রকৃতির মতোই এক ঝর্ণা।

ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। লালুর বাড়িতে বাবা-মা আছেন। বাবা জমি দেখাশোনা করেন। ওদের জমিতে বছরে একশ' মন ধান হয়। ওর এক ভাই কোলকাতায় গানশেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। আরেক ভাই সায়েন্স নিয়ে লেখাপড়া করছে। লালু বেশি লেখাপড়া শেখেনি।

— ক্যায়সে শিখু বাবুজি, ম্যয় যব দশ বরষ কা থা, তব এহি বাংলোমে আয়া কামকাজকে লিয়ে। ব্যস, তবসে ইধারই রহ গিয়া ল্যাম্পপোস্টকা মাফিক।

ছুটিছাটা নেই? আছে। সপ্তাহে একদিন। সেদিন কুরুতে হাট বসে। ও দরকারী জিনিসপত্র কিনতে যায়। কুরুতে ওর ঘর আছে। ঘরে বউ আছে। বাজার নিয়ে লালু ঘরে যায়। পরদিন আবার বাংলোয় ডিউটিতে আসে।

আমরা দুজনে মাতৃভাষায় বলাবলি করছিলাম ওর সম্পর্কে। আদিবাসী সাঁওতাল ছেলে। কথার মধ্যে বেশ ইংরেজি শব্দ এসে যাচ্ছে। বাংলোয় সাহেবসুবোদের আমদানি।

লালু বলল — ম্যয় বাংলা সমঝতা থোরা থোরা। বোলনে নেহি সেকতা। সমঝমে আতে।

আমাদের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। আদিবাসী সাঁওতাল ছেলে আর তিরধনুক থাকবে না, তা কি হয়! জিজ্ঞাসা করলাম — তোমার তিরধনুক আছে? লাঠিখেলা জানো?

— থোরা থোরা। আচ্ছাসে শিখা নেহি। দশ বরষসে ইধারই পড়া হু, কহা না আপকো।

বাংলোর ঘরগুলো পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে সাজানো গোছানো। ফায়ার পে-স আছে। বেড(মের পাশে টয়লেট। রান্নাঘর একটু দূরে। কমলেন্দুকে বললাম — থেকে যাবে নাকি একটা রাত? দারুণ জমবে। জাস্ট ভাবো, মাটির উপর জেগে ওঠা ওই পাহাড়, মালহান পাহাড়ের স্ফীতি, তাকে জড়িয়ে চাঁদ উঠছে।

কল্পনা করছি, চাঁদের রজত-চুম্বন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে বনে প্রান্তরে অন্ধকারে গাঢ় নির্জনতায়। আমরা বসে আছি চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছি না। মুহূর্তগুলো মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে। একটু শীত করছে। মাঝেমাঝে কেঁপে উঠছি। শীতে না শিহরণে, জানি না।

— সবই বুঝলাম। আমারও তো খুব ইচ্ছে করছে। মেসে মানিকদা-মেজদাকে বলে আসিনি। ওরা খুব ভাববে।

— আরে ধ্যাৎ, রাত্তিরে তো ধাওয়া করে আসবে না। কাল খুব সকালেই চলে যাব। শুধু আজকের রাতটা।

হঠাৎ হো হো করে কমলেন্দু হেলেদুলে হাসতে লাগল। বলল — না-থাকার আসল কারণটাই তো বলা হয়নি। আমঝরিয়ায় চাঁদনি রাতে ওই পাহাড়ের কোলে বসে তুমি আর আমি গান গাইব, তুমি আর আমি, কোন মানে হয়? জানা রইল, পরে আসা যাবে'খন — দুজনে নয়, চারজনে।

খোটুয়াগ পাহাড়ে সূর্য অন্তরালে চলে গেল। দিনশেষের আলোর তীব্রতা কমে গিয়েছিল অনেকটা। বাতাসে শীতের আমেজ। মনোরম রোমাঞ্চকর স্পর্শ। পশ্চিম

আকাশের পলাশ-রক্তিমতা ধীরে ধীরে বুড়িয়ে যেতে লাগল। নিচের অরণ্য আরো রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল। মহুয়ামিলানের লাল কেবিন এখনো দেখা যাচ্ছে।

লালু ওঁরাও ঘরের ভিতরে গেল গরম জামা গায়ে চাপাতে।

না, থাকা হল না আমঝরিয়ায়। পড়ি-কি-মরি করে বাসের জন্য দৌড় লাগালাম। বাসটা নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।